আমার পাড়ার মেয়েরা

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

একেকটা জানালা, একেকটা বারান্দা যেন এক-একটা সিনেমার পর্দা আমার। সেখানে মর্নিং শো আছে। ম্যাটিনি-ইভনিং-নাইট শো-ও আছে। আমি বেলায় বেলায় একেকটা ছবি দেখি এক এক পর্দায়, আমার ছাদের একেক আলসের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। আমার নায়িকারা কেউ সোফিয়া লোরেন, কেউ সুচিত্রা সেন, কেউ নূতন কিংবা ওয়াহিদা। একেক বেলায় সকাল, দুপুর কি বিকেলের রোদের একেক লাইটিঙে। একেকে মেজাজে আমি পাই আমার নায়িকাদের।

আমার দুটো বিলিতি নায়িকা, বাকিরা দিশি। আমাকে এখনও সিনেমা হলের অ্যাডাল্ট ফিলমের ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু আমার এই ছাদের ব্যালকনি সিটের থেকে দিনের পর দিন আমি নানা রঙের প্রাপ্তবয়স্ক ছবিতে মজে আছি। ঠিক এই মুহূর্তে আমার সামনে আমার নায়িকা মার্লিন ওয়াটসন। যার আমি নাম রেখেছি সোফিয়া লোরেন।

মার্লিন এইমাত্র ওর বর সিরিলের সঙ্গে একপ্রস্থ ঝগড়াঝাঁটি, হাতাহাতি করে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফর্সা মুখটা ওর রাগে গোলাপি হয়ে আছে। কান্নাকাটির জন্য চোখ দুটো ফোলা ফোলা। মুখে বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে হন বন করে ছুটছে মোড়ের দিকে। সিরিল একবার বারান্দায়

এসে গর্জন করে বলল, মার্লিন! ডোন্ট গে। লেট মি এক্সপ্লেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

এই মুহূর্ত থেকে বলা যায় মার্লিন কিছুক্ষণের জন্য আমার বান্ধবী হয়ে গেল। সিরিল যেই মুখের জ্বলন্ত সিগারেট রাগের মাথায় 'শিট!' বলে ছুঁড়ে ফেলে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল আমি মার্লিনকে আমার হৃদয়ের মধ্যে আঁটোসাঁটো করে পুরে ফেললাম। আমার মনের ভেতরের ফিলম প্রোজেক্টরটা ভোঁ করে চালু হয়ে গেল।

পরিষ্কার করে বলি বরং—মার্লিনকে আমার ভীষণ ভালো লাগে! কী সুন্দর ফর্সা গোলাপি রং। লাল টুকটুকে ঠোঁট! সোনালি চুল ঘাড় অব্দি গড়াচ্ছে; চোখে মেমসায়েবি চাউনি (অ্যাংলোরা মেমসায়েব বই কী!) হিলহিলে শরীর দুলিয়ে খটখট হাঁটা, আর আমাকে দেখলেই একগাল হেসে হাউ আর ইউ, নিটু? সম্বোধন সব কিছু আমাকে ভেতরে ভেতরে পাগল করে দেয়। মনে হয় ছুটে গিয়ে ওকে জাপটে ধরে একটা চুমু দিই ওর বর সিরিলের কায়দায়!

হ্যাঁ, সিরিলের এইসব চুমু আমি দেখি একেক সন্ধ্যেয় ছাদের পড়ার ঘর ছেড়ে সামনের আলসেতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। প্রায় খেয়েই ফেলে যেন বউয়ের মুখটা ওই পেটুক সাহেব। আমার শরীরের ভেতরটা কীরকম কীরকম যেন করে। মনে হয় হৃৎপিন্ডটা লাফাচ্ছে। একটু একটু লজ্জা করে, বেশ মজাও পাই। আবার কীরকম একটা দুঃখও হয়।

অ্যাংলো সায়েব মেমদের বোধ হয় লজ্জা-টজ্জা কম। জানলা হাট করে খুলে কেউ এই সব করে! অবিশ্যি রাতের বেলায় অন্ধকারে ছাদে দাঁড়িয়ে কে কী দেখল, তাতে আর কী এসে যায় ওদের?

কিন্তু আমার এসে যায়। অত সুন্দরী কারও গা থেকে একটা একটা করে জামা খুলে নিলে আমার ভয়ানক বিপদ হয়। আমার শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাতের তালু ঘামে, মাথা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে জমা পড়া সারাদিনের পড়াশোনা কপূরের মতো উবে যায়। ভাবনা হয় মা বা কাকা এইসব জানলে কী সব্বোনাশ! অথচ সাপুড়ের বাঁশির মতো দৃশ্যটা দুলে দুলে আমার মনের ভেতরেও জেগে ওঠা সাপটাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। আমি জায়গা ছেড়ে নড়তেও পারি না। একেক দিন এমন মনে হয়েছে হাঁটুর নীচ থেকে আমার পা দুটো কেউ কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

তবে সেই সন্ধ্যায় যেদিন সিরিল মার্লিনের বডিসটাও খুলে নিয়ে ওর দুধের মতো সাদা বুকে মুখ ঘষতে লাগল, আমি ভয়ের চোটে ছাদের অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দুদ্দাড় করে পালিয়ে গিয়েছিলাম। যেন ভূত দেখেছি। আর পড়বি তো পড় গিয়ে সটান রাঁধুনি বড়ো ঠাকুরদার সামনে। সে আমার ওই অবস্থা দেখে ভড়কেই গিয়েছিল। আমার দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, কী হইয়েছে তুমার সাহিব? ভূত দেখিয়েসো নাকি? আমি ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম, না, না, কিছু না। সিঁড়ি অন্ধকার তো, ভয় খেয়ে গেছি। বড়ো ঠাকুরদা আমার দুই চোখে চোখ ফেলে বললে, আলবৎ কুসু দেখেসো। কত্তো বড়ো চোখ হইয়েছে তুমার। শেষে রাগের মাথায় বলেই ফেললাম, হ্যাঁ, তাই হয়েছে। আমি ভূত দেখেছি।

আর এই এখন যে সিরিলের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে গেল মার্লিন। আমি চিলেকোঠার পড়ার ঘরে ঢুকে মনের ভেতরের প্রোজেক্টর চালিয়ে ওই দৃশ্যগুলো দেখা শুরু করব। মনের দগদগে ক্ষতের মতো দৃশ্য সব। যার কিছু ভোলা যায় না। কেবল সিরিলের জায়গায় পুরুষটা হয়ে যাব আমি। আমি তখন একটা একটা করে জামা খসাব মার্লিনের শরীর থেকে, শেষে বেরিয়ে আসবে ওর ওই দুধ সাদা বুক, আর...

নীতু! নীতু! নীচ থেকে হাঁক কাকার। আমি উত্তর করলাম যাই কাকা! বলে নামতে লাগলাম ছাদের সিঁড়ি বেয়ে। আর ভেতরে ভেতরে গজরানি আমার নাঃ! এ জীবনে শান্তি বলে কিছু নেই। নিজের মতো একটু থাকব তার জোর নেই।

কিন্তু কাকার সামনে পড়ে এক্কেবারে থমকে গেলাম। কাকার মুখ কী গম্ভীর। কেমন ব্যথা ব্যথা ভাব। আমি ভাবতে বসলাম, কী এমন করেছি যে কাকার এত কষ্ট হল। আমি চুপ করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কাকা বলল, তোমার বন্ধুরা আজ শহর ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে, ওদের মা তোমাকে আজ ওদের ওখানে যেতে বলে গেলেন। তুমি যেয়ো।

আমি বুঝেই উঠতে পারলাম না কাকা বন্ধু বলতে কাদের কথা বলছে। তাই জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কাদের কথা বলছ, কাকা?

কাকা বলল, কাদের আবার? তোমার ওই ডম্বল আর ডোম্বলের কথা। মৃণালিনী বলছিল ওদের বাবা মারা যাবার পর থেকে সংসারে অভাব লেগেছে। ওদের তাই মামাবাড়িতে থেকে পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়েছে। আর দুপুরে মামা এসে নিয়ে যাবেন ওদের।

ভেতরটা অসম্ভব মোচড়াতে শুরু করল। একটা কান্না কাঁদতে ইচ্ছা হল। মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, মামাবাড়ি কোথায়?

কাকা বলল, আসামের কৈলাশহরে!

আমার ভেতরটা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। ডম্বল আর ভোম্বল তাহলে চলে যাবে? আমার ওই নিত্যদিনের সঙ্গীরা না থাকলে কার সঙ্গে পুজোর সকালে

শিউলি কুড়োতে যাব? কাদের সঙ্গে গিয়ে ভিড় বাড়াব রথের মেলায়? দেশলাইয়ের টেলিফোন বানিয়ে কাদের সঙ্গে মনের কথা কইব? কাদের সঙ্গে গিয়ে দুপুরবেলায় বসে 'অনুরোধের আসর' শুনব? কে আমাকে প্রশ্ন করবে, আচ্ছা নীতু, তুই তো ইংরেজিতে পন্ডিত। বল তো ইংরেজিতে প্রেমিক শব্দের মানে কী?

মনে আছে ওদের ওই প্রশ্নটার উত্তরে বললাম, লাভার। তাতে দিগগজ ডাম্বল বলল, ধ্যাত! সেদিন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলাম উকিল বংশীকাকা বলছে প্রেমিকের ইংরেজি 'প্রস্টিটিউট। আমি তখন ভয়ঙ্কর তাচ্ছিল্যের কন্ঠে শুনিয়ে দিয়েছিলাম, তোমার মাথা আর বংশীকাকার মুন্ডু। প্রস্টিটিউটের মানে হল খারাপ স্ত্রীলোক।

তখন ভোম্বল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, তাহলে তো ঠিকই হল। প্রেম তো খারাপ স্ত্রীলোকেরাই করে। তাই না?

আমি আর কথা বাড়াইনি। শুধু মনে মনে বললাম, মূর্খদের জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই। যা জেনেছে তাই জানুক।

আর এখন সেই মূর্খদের জন্যে প্রাণ কাঁদছে আমার। কাকাকে বললাম, ঠিক আছে, যাব।

সকাল কেটে দুপুর হতে যে কত সময় লাগল তা ভগাই জানে। বইয়ের পাতা উলটোচ্ছি আর ডম্বল-ভোম্বলের কথা ভাবছি। স্নান করছি আর ওদের মুখ দুটো চোখের সামনে। ভাসছে। আর তারপরই ওদের দুই দিদি লালিমা আর গরিমার মুখ। আমরা শর্ট করে ডাকি লিমা আর রিমা বলে। ভাবছিলাম কে আর এরপর ওদের জন্য সুচিত্রা উত্তমের ছবির ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কেটে

এনে দেবে। কে ওদের জন্য পাড়ার জগুদার হোলনাইট ফাংশনে সিট ধরে রাখবে। কে ওদের কাছে ফুচকার পয়সা চাইবে? কে আর আমাকে ওদের বাথরুমের দরজার ফুটোর সামনে বসিয়ে বলবে দিদিরা চান করছে। দেখবি?

আমি সেই ফুটোতে চোখ রেখে যেন স্বর্গে চলে গেলাম। লিমা আর রিমা চান করছে, একজন আরেকজনের গায়ে সাবান মাখাচ্ছে। একজন আরেকজনের গায়ে বিশেষ বিশেষ জায়গা খুঁটিয়ে দেখছে। রিমা লিমার বুকের বোঁটা দুটো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে। তারপর একটা বোঁটায় ঠোঁট ছোঁয়াল। জিভ দিয়ে চাটল।

তখন ডম্বল আমাকে ঠেলা মারল, সর, সর, আমি একটু দেখি। আমি সরতেই ডম্বল সেখানে ফিট হয়ে গেল। আমি সরে এসে দেখি ভোম্বল মুখ গুঁজে সিঁড়িতে বসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল তোর আবার? মুখ তুলে বলল, দিব্যি খেয়ে বল একথা কাউকে বলবি না?

আমি বললাম, কোন কথা?

—এই যে আমরা ফুটো দিয়ে সব দেখি।

–সে কী! তোরা রোজ দেখিস নাকি?

–না তো কী? খুব ভাল্লাগে দেখতে। কী হয়েছে, নিজেরই দিদি ওরা।

দুপুরের ভাত আর মাংস খেয়ে ডোম্বল আর ডম্বলের সঙ্গে শেষবারের মতো বসলাম গিয়ে ওদের কলের গানটার পাশে। ভাইদের জন্য দিদিরা একটা ছোট্ট উপহার এনেছে আজ। একটা নতুন রিলিজ হওয়া রেকর্ড। পাশের ঘরে মাসিমা অঝোরে কাঁদছে দুই ছেলের জন্যে, ফের কবে বাড়ি আসবে কে জানে।

লালিমা রেকর্ডটা চাপিয়ে দিল কলের গানে। পাশে বসে গরিমা যন্ত্রে দম দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘরের কান্নায় ভরা নীরব হাওয়ার মধ্যে পান্নালাল ভট্টাচার্য গেয়ে উঠলেন, 'মা আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা। এবার চোখ বেয়ে ধারা নামল আমার।

সন্ধ্যেবেলায় আলতো পায়ে ফের গেলাম। ডোম্বল-ডম্বলদের বাড়ি। দেখি সারাবাড়িতে একটা আলো জ্বলছে, বাকি সব অন্ধকার। যে-ঘরে আলো সেখানে চুপ করে বসে জানলার বাইরে অন্ধকার দেখছে লিমা। আমার পায়ের শব্দে চটকা ভাঙতে মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল

কে নীতু? এসেছিস?

বললাম, আর সবাই কোথায়? লালিমা বলল, শিবমন্দিরে পুজো দিতে গেছে।

-তুমি গেলে না?

–না রে, কিছু ভালো লাগছে না। খুব কষ্ট হচ্ছে।

বললাম, আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে লিমাদি।

লালিমা বলল, জানি। সব ব্যাপারেই তো তোরা একসঙ্গে থাকতিস।

বললাম, সে আর বলতে! কত খারাপ কাজই না করেছি একসঙ্গে।

লালিমা চমকে উঠল। খারাপ কাজ। কী খারাপ কাজ করেছিস তোরা?

আমি মাথা হেঁট করে বসে রইলাম। লিমা ফের শুধোল, কী খারাপ কাজ? বল আমাকে আমি কাউকে বলব না।

বললাম, সে তো তুমি বলবে না। কিন্তু ক্ষমা করে দেবে বলো।

লিমা বলল, হ্যাঁ রে বাবা দোব। নে দিলাম।

আমি আমতা আমতা করে বলা শুরু করলাম—আমি ভোম্বল আর ডম্বল তোমাদের দেখেছি...

লিমা এবার রীতিমতো উদবিগ্ন— কী দেখেছিস আমাদের?

–তোমাদের চান করতে দেখেছি।

গমের মতো রং লালিমার, তাতে সূর্যডোবার ছটা লাগল যেন। ওর চোখ দুটো বন্ধ করে বসে রইল চুপচাপ। কিন্তু আমি আর থামতে পারছি না, বলেই চলেছি, আমরা দরজার ফুটো দিয়ে তোমাকে আর রিমাকে সাবান মেখে খেলা করতে দেখেছি।

লিমা সব শুনেও সেই চুপ করে আছে। তারপর হঠাৎ আমার মাথাটা টেনে নিয়ে গালে একটা চুমু দিল। দিয়ে বলল, যাঃ। কাউকে বলিস না, ক্ষমা করে দিলাম।

আমি ফের আমতা আমতা করে শুরু করলাম, আর তো তোমাদের ওভাবে দেখতে পাব

...

-তো?

-তো, আরেকবার দেখতে দেবে তোমার বুকটা।

লালিমা চোখ বড়ো করে আমার দিকে চাইল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, কী দেখতে

চাস?

—তোমার বুক দুটো।

–কেন? এত রসকষ কীসে ভালোমানুষের পো?

—আর তো দেখতে পাব না।

লালিমা হঠাৎ ওর টেপফ্রকের পিছনে বোতামগুলো পটপট করে খুলতে লাগল। তারপর হাতার থেকে হাত দুটো ছাড়িয়ে জামার ওপরের অংশ নামিয়ে বুক দুটো খুলে দিলে আমার সামনে। আর আমি একদম থ।

তাকিয়ে দেখেই যাচ্ছি তো দেখেই যাচ্ছি, সাধও মেটে না, কথাও ফোটে না। আর লালিমা একনজরে দেখে যাচ্ছে আমার চোখ দুটো। জানি না কখন এক সময় আমার ডান হাতটা গিয়ে স্পর্শ করল লালিমার ডান বুক। আদরের ভঙ্গিতে হাত বুলোনো শুরু করলাম। যেন খেলা করছি নিজের সঙ্গে। কিংবা পাড়ার ছোট্ট সরস্বতী প্রতিমার সঙ্গে।

হঠাৎ যেন একটা ঘোরের মধ্যে থেকে উঠে এসে লালিমা বলল, আমি এখান থেকে চলে গেলে তোর কষ্ট হবে?

আমি ওর বাঁ-দিকের বুকটায় আদর করতে করতে বললাম, কেন এসব অলক্ষুণে কথা বলছ?

লালিমা বলল, সত্যি রে। আমার সম্বন্ধর খবর দিয়ে গেছে মামা। হয়ে গেলে তো চলে যাব।

আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। লিমার খোলা বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সিরিলের ঢঙে মুখ ঘষতে ঘষতে বললাম, না, না, তোমরা সবাই এভাবে ছেড়ে চলে গেলে আমি কাদের নিয়ে থাকব?

আমার গলাটা ভেঙে এসেছিল। লিমা আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলোতে বলল, নে ছাড়, মা-রা এসে পড়বে কোন সময়। আমি লিমার মুখে, ওর বুকের বোঁটায় দুটো চুমু দিয়ে ঘর ছেড়ে গলির অন্ধকারে পড়লাম।

২.

আমার ম্যাটিনি শোয়ের নায়িকারা দিন দিন সংখ্যায় বাড়ছে। ফ্ল্যাটের চিলেকোঠার ঘরে বসে খেয়াল রাখি মার্লিনদের পাশের ফ্ল্যাটের টুম্পা কখন লোরেটো থেকে ফিরে ওদের বসার ঘরের কাচের শার্সি খুলে নীচে তাকাবে মাথায় বাক্স নিয়ে ঘোরা কেক-প্যাটিসের জন্যে। ও তখন হাত নাড়ে আমায় আমিও হাত নাড়ি।

একদিন এরকম প্যাটিস কিনছি আমরা, হঠাৎ ও বলল, নীতুদা, তুমি ইশকুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ?

বললাম, তা কেন? এখন তো আমার গরমের ছুটি চলছে। আরও এগারো দিন আছে। টুম্পা বলল, তারপর তো তুমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে?

বললাম, তাতে তোর কী অসুবিধে?

-না, মা, বলছিল তুমি ইংলিশে খুব ভালো। আমার কয়েকটা পড়া যদি দেখিয়ে দাও।

–কী পড়া?

—দুটো কবিতা। বেশ টাফ লাগে।

–ওয়াল্টার ডি লা মেয়রের। দ্য লিসনার্স' আর উইলফ্রেড ওয়েনের 'স্ট্রেঞ্জ মিটিং'।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, তোমাদের এসব কবিতা পড়ানো হয়?

ও বলল, বা রে! আমরা কি বাচ্চা আছি নাকি?

-তাহলেও ...

–কেন তোমার কাছেও কঠিন লাগছে?

বললাম, তা না। তবে জানিস কী এই দুটো কবিতাতেই ভূত আছে।

হঠাৎ হাতে প্যাটিস নিয়ে খিল খিল করে হাসতে লাগল টুম্পা। বলল, সেজন্যই অ্যাভয়েড করছ? কেন তুমি তো দিব্যি রাতের বেলায় ছাদের ঘরে একলা পড়। তোমার তো আর ভূতের ভয় নেই।

আমতা আমতা করে বললাম, কিন্তু তুই পারবি আমার ওই ছাদের ঘরে গিয়ে পড়ে আসতে?

কীরকম সিটিয়ে গেল টুম্পা—জানি না, মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কেন, তুমি পার না আমাদের বাড়ি এসে পড়াতে?

বললাম, না। তোমার পাশের ফ্ল্যাটের সিরিলটাকে দেখলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। টুম্পা অবাক হয়ে বলল, সে আবার কী! ও তো খুব ভালো মানুষ। টিপিক্যাল অ্যাংলোইণ্ডিয়ান নয়। ওর সঙ্গে আবার তোমার কী হল?

বললাম, কিছু না। তবে ও মার্লিনকে মারে। আমার একদম এটা পছন্দ নয়।

টুম্পা বলল, তাহলে বলো আমাকে পড়াতে চাও না। তাই তো?

—তাহলে তাই।

বলে আমার হাতের প্যাটিসটাও ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে এলাম। মার্লিনের কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া আমার চোখের সামনে ভাসছে। ভাসছে ডম্বল-ডোম্বলের মামার হাত ধরে কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য। ভাসছে লালিমার খোলা বুক। একটা গোটা বছর গড়িয়ে গেছে, কিন্তু দৃশ্যগুলো এতটুকু পুরোনো হয়নি। ইতিমধ্যে লালিমার বিয়ে হয়ে উত্তরপাড়া চলে গেছে। হঠাৎ এক সকালে পায়খানায় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে কাকা দেহরক্ষা করেছেন। বাবার মৃত্যুর পর কাকাই মাথার ওপরে ছিলেন। সেই তিনিও চলে গেলেন। মা বলেছে, সামনের বছর থেকে আমি বোর্ডিং-এ থেকে পড়ব। এই এত কিছুর মধ্যে আমি শান্তি পাই নানা ইংরেজি বই পড়ে আর নানা বারান্দায় আর জানালায় আমার সোফিয়া লোরেন, সুচিত্রা সেনদের

দেখে। কিন্তু এদের কারও সঙ্গেই প্রায় আমি মিশতে পারি না। শুধু একটা বছরেই আমি কী ভীষণ বদলে গেছি!

আমি জানতাম আমার ছাদের ঘরে এসে পড়তে বললে টুম্পা আসতে পারবে না। আমাদের এই মধ্যবিত্ত পাড়ায় সন্ধ্যের অন্ধকারে একলা কোনো মেয়েকে কোন মা ছাড়বে একটা ছেলের কাছে পড়া বুঝতে? আর যতই হালফ্যাশানি হোন না কেন টুম্পার মা, তিনি বেশ ভালোই জানেন, তাঁর মেয়ে সুন্দরী, উঠতি বয়স আর আমার ইংরেজি বিদ্যার ওপর ওর দুর্বলতা আছে। ইংরেজিতে ভালো হলে আমাদের পাড়ায় সাত খুন মাফ। এ পাড়ায় যার অঙ্কের মাথা সব থেকে বেশি সেই নির্মলেন্দুকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু ইংরেজিতে কেরামতি থাকলেই হল, মাঝে মাঝে আমি যখন মার্লিনের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কই টুম্পার মা, গজার বাবা, তিলকের কাকা দিব্যি পাশে দাঁড়িয়ে মাথা হেলিয়ে শোনেন। একদিন তো তিলকের কাকা বলেই দিলেন, বাঃ বেশ বলছ তো ইংরেজি। হবে না? তোমার বাবা ইংরেজিকে তো মাতৃভাষাই করে ফেলেছিলেন। কী দারুণ প্লিড করতেন কোর্টে দাঁড়িয়ে। সে সব শোনা আছে। তুমি নিশ্চয় বাবার ওকালতির লাইনে যাবে? আমি হ্যাঁ, না কিছু না বলে সরে এসেছিলাম।

তবু টুম্পা বলেছিল বলেই কি না জানি না। গত তিন-চার দিন আমি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ওয়েন আর ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের কবিতা দুটো পড়ি। সন্ধ্যের অন্ধকারে একলা বসে যখন ওয়েনের 'স্ট্রেঞ্জ মিটিং' থেকে পড়ি :

I am the enemy you killed; my friend
I knew you in this dark; for so you frowned.
Yesterday through me as you stabbed and killed
I parried, but my hands were loath and cold.
Let us sleep now.....

কিংবা ডি লা মেয়ারের ‘লিসনার্স’ থেকে পড়ি—

Is there anybody there? said the Traveller
Knocking on the moonlit door
And his horse in the silence champed the grasses
Of the forest’s ferny floor.

আমার মনে হয় এক নির্জন, ভৌতিক অন্ধকারে জায়গা করে নিয়েছি আমি। আমার এই চিলেকোঠার ঘর তখন আর ঘর থাকে না। তেপান্তরের মাঠ হয়ে যায়। আমার গায়ের নোম দাঁড়িয়ে যায়, আমি মৃত্যুর পরপারে কোনো জগতের স্বাদ পাই। মনে মনে তখন ধন্যবাদ দিই টুম্পাকে এই কবিতা দুটোর কথা বলার জন্য। আমার স্বর্গত বাবা আর কাকার জগতে চলে যাই, আমি ছাদের অন্ধকারে ভর করে।

ওয়েন আর ডি লা মেয়ারই পড়ছিলাম, যখন দরজার শিকল বাজিয়ে কে আওয়াজ দিল যেন। উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি টুম্পা, হাতে বই। বললাম, কী ব্যাপার টুম্পা? এরকম সময় এখানে?

-কী করব, তুমি তো পড়াতে গেলে না।

–তোর মা জানেন?

—মা-ই তো বলল, ও আসবে না। তুই পড়াটা দেখে নিয়ে আয়। বললাম, ভেতরে আয়। ও ভেতরে ঢুকে আমার ঘরটা চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর বলল, বেশ ঘর তোমার। ভূতের কবিতা পড়ার পক্ষে আইডিয়াল।

আমি ভেতরের আড়ষ্ট ভাবটা কাটানোর জন্য বললাম, ওসব ছাড়, বই খোল।

টুম্পা আমার ডি লা মেয়ারের কবিতার খোলা পাতাটার দিকে চোখ ফেলে বলল, আমি কী খুলব? তুমিই তো খুলে বসে আছ।

আমি হেসে বললাম, তা পড়াতে গেলে নিজেকে একটু তৈরি হয়ে নিতে হয় না?

এবার টুম্পার হাসির পালা। বলল, তাহলে তুমি জানতে আমি আসব? আমি বললাম, হ্যাঁ। ও জিজ্ঞেস করল, কী করে?

বললাম, সে তুই বুঝবি না। ও খেপে উঠল, কেন আমি কি কচি মেয়ে নাকি?

এবার আমি ধমক দিলাম, তুই পড়বি, না, এইসব বাজে বকবি?

টুম্পা তাড়াতাড়ি বই খুলে ফেলল। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, না তুমি দেখছি ভালো মাস্টারমশাই হবে।

আমি ফের গর্জালাম, আবার।

আর তক্ষুনি 'লিসনার্স' এর শেষ দুটো লাইন মুখস্ত আউড়ে আমাকে স্তম্ভিত করে দিল টুম্পা–

'Tell them I came, and no one answered.
That I kept my word,' he said.

কথাগুলো আউড়ে মুখ নীচু করে টুম্পা বসে রইল আমার পড়ানো শুনবে বলে। আর আমার মগজের মধ্যে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। শেষে

কোনো মতে বললাম, হঠাৎ এই লাইনদুটো মুখস্থ বলার মানে কী? মুখ না তুলে টুম্পা বলল, সে তুমি বুঝবে না। তুমি পড়াও বরং।

আমি এবার সরাসরি কবিতায় চলে এলাম। বললাম, কবিতার পরিবেশটাই আসল। পরিবেশটাই কবিতা। ধ্বনির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা নিস্তব্ধতার কবিতা। চাঁদের আলোয় মায়াবী মূর্ছনায় ধরা এক অশরীরী জগৎ। সে জগতেরই দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছে কবিতার নায়ক, পর্যটক। মানুষের জগতের এক প্রতিনিধি সে, সংলাপ তৈরি করতে চাইছে জীবনের ওপারের নীরব শ্রোতাদের সঙ্গে...।

হঠাৎ একটা গান বেজে উঠল কাছেই, আর আমাদের নীরব পরিবেশে অশরীরীদের আহ্বানে ছেদ পড়ল। ঘরের পেছনের জানালা দিয়ে দেখি রেডিওগ্রামে এলভিস প্রেসলির গান চালিয়ে নাচ প্র্যাক্টিস করছে আমার আর এক নায়িকা লোরেন সুইন্টন।

চমকে উঠেছিল টুম্পাও। মুখের সামনে থেকে বই নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, ওটা কী শুরু হল নীতুদা? আমি সংক্ষেপে উত্তর করলাম, ক্যাবারে নাচের রিহার্সাল।

ও জিজ্ঞেস করল, কে নাচছে?

বললাম, লোরেন সুইন্টন।

ও বিস্ময়ের সুরে বলল, ওই সুন্দরী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানটা? যার মা ক্যাবারে নাচে?

বললাম, সবই তো জানিস দেখছি। তাহলে জিজ্ঞেস করছিস কেন?

ও আমার পাশে সরে এসে জানলার বাইরে চোখ মেলল, আমি একটু দেখি নীতুদা।

আমি ঝাঁজিয়ে বললাম, তুই কি এই করতেই এসেছিস তাহলে? পড়বিটা কখন?

—সে না হয় আবার আসব। দেখি তো আগে।

ও লোরেন সুইন্টনকে দেখতে লাগল। আর আমি ওকে। টুম্পাকে এভাবে কখনো দেখিনি। ফ্রকই পরে আছে, কিন্তু এক পূর্ণ যুবতীর রূপরেখা ছড়িয়ে পড়েছে সারাশরীরে। আমার নিজের তাকানোতে নিজেরই কেমন লজ্জা হতে শুরু করল। আমি ওর থেকে চোখ সরিয়ে ওর মাথার ওপর দিয়ে লোরেনকে দেখব বলে চোখ চালালাম। আর যা ভয় করছিলাম ঠিক তাই। ঘরের জানালা হাট করে খুলে একটা ব্রা আর জাঙ্গিয়া পরে নাচছে সুন্দরী যুবতী মেমসায়েব। আর সেটাই পর্দার সিনেমার মতো দেখছে এই চুড়ি।

আমি গর্জন করলাম, টুম্পা জানলা বন্ধ কর।

ও অম্লান সারল্যে প্রশ্ন করল, তুমি পড়ার বাহানা করে এইসব দ্যাখ!

বললাম, পড়ার বাহানা করে দেখি না। পড়তে পড়তে দেখি।

টুম্পা জানলা বন্ধ করতে করতে বলল, অসভ্য মেয়ে কোথাকার।

আমিও ছাড়বার পাত্র নই, বললাম আর তুমি খুব সভ্য। পড়ার নাম করে এসে ওইসব দেখছ! ও মুখ ভেঙচিয়ে বলল, বেশ করেছি দেখেছি, ফের দেখব। বলে জানলা খুলতে গেল ও। আমি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা চেপে ধরলাম।

কিন্তু এ কী! ওর গায়ে তো আগুন বইছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তোর কি জ্বর হয়েছে? তখনও ওর উষ্ণ হাতটা আমার হাতে চাপা। ও থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল হ্যাঁ, ওষুধ দাও।

আমি এক ঝটকায় ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ওর ঠোঁটে চুমু দিলাম। ও দুটো হাত দিয়ে আমার মাথাটা ওর মুখের ওপর চেপে ধরল—আই লাভ ইউ নীতুদা। আই লাভ ইউ।

আমি আস্তে আস্তে ওর বুক স্পর্শ করলাম। কী অপূর্ব অনুভূতি। ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, আলো নিভিয়ে দেব। ওর মুখ ভেসে যাচ্ছিল ঘামে। চোখ বন্ধ। বলল, দাও।

আমি লাইট নিভিয়ে ওর জামাটা খুলতে লাগলাম। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, এবার কী করবে তুমি? বললাম, বড়োরা যা করে। ওর ভয় বোধহয় বাড়ল। জিজ্ঞেস করল, কোনো ক্ষতি হবে না তো আমার? কোত্থেকে এক অন্ধবিশ্বাস জন্মাল আমার, বললাম, ধুর! কিচ্ছু হবে না।

ওর সব জামা খুলে ফেলেছি। নিজের পরনের প্যান্ট শার্টও ছুঁড়ে ফেলেছি। ওকে জড়িয়ে ধরে সারাশরীরে আদর ঢেলে দিচ্ছি, এক অদ্ভুত পাগলামির মধ্যে ডুবে গেছি আমরা। আমি অন্ধকারে ওর ওই গোপন জায়গাটা হাতড়ে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ টুম্পা বলল, নীতুদা আজ থাক।

আমি উদবিগ্ন হয়ে অপরাধীর মতো জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কী হল?

ও অন্ধকারে ওর জামা খুঁজতে খুঁজতে বলল, মা বলেছিল এই ঘরটার ওপর নজর রাখবে।

বললাম, তো কী হয়েছে? অত দূর থেকে এই ছাদের ঘরের ভেতরে কী হচ্ছে দেখা যায় নাকি?

ও জামা পরা শেষ করেই ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল। আমি তখনও সেই জন্মদিনের পোশাকে বসে আছি। টুম্পা বলল, কিন্তু আলো তো দেখা যায়!

এক মুহূর্তে আমার সব রোমাঞ্চ মাথায় চড়েছে। আমি দুদ্দাড় করে জামাপ্যান্ট গলিয়ে পিছনের জানলা ধাক্কা মেরে খুলে ডি লা মেয়ারের বদলে ওয়েনের কবিতা 'স্ট্রেঞ্জ মিটিং' খুলে বসলাম। টুম্পা ওর জায়গায় বসে কবিতার পাতা খুঁজতে লাগল ওর বইয়ে।

আমার ভেতর থেকে কে যেন ঠেলে বার করে আনল কথাগুলো, টুম্পা তোকে 'স্ট্রেঞ্জ মিটিং' বা আজব সাক্ষাৎ পড়ানোর কথা ছিল। আর কী এক সাক্ষাৎ হয়ে গেল আমাদের।

টুম্পা লাজুক স্বরে বলল, আমার ঠোঁটে দাগ নেই তো, নীতুদা? বললাম না।

—গালে?

—কোথাও নেই?

–যদি থাকে সেটা মনে। সেখানে কেউ দেখতে পাবে না।

–তুমিও না?

আমি সিঁড়িতে কাদের পায়ের শব্দ শুনলাম। কেউ বা কারা উঠে আসছে। অথচ টুম্পার প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হয়নি। এই ক-দিনে 'স্ট্রেঞ্জ মিটিং'-এর আগাগোড়া আমার মুখস্ত। টুম্পার প্রশ্নের জবাব দেব বলে পড়তে শুরু করলাম

Courage was mine and I had mystery
Wisdom was mine and I had mastery
Into vain citadels that are not walled
… … … …
… … … …
Even with truth that lie too deep for taint
I would have poured my spirit without stint
But not through wounds, not the cess of war.

কবিতার পঙক্তির যে কী মানে হয় তা বোঝার বয়স হয়তো হয়নি টুম্পার। কিন্তু কবিতার এইসব কথা হঠাৎ এক অন্য মানে নিয়ে, প্রায় আমার নিজের কথা হয়ে ওর কিশোরী মনে দোলা দিল। কিছু না বলেও মনে হল যেন সব বোঝাতে পেরেছি এক লহমায়।

ঠিক তখন আমাদের কাজের লোক বুড়িমাকে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন মাসিমা। টুম্পার মা এক গাল হেসে বললেন, আমি উঠতে উঠতেই শুনতে পাচ্ছিলাম তোমার পড়ানো। কী সুন্দর! তুমি মাঝে মধ্যে ওকে একটু ইংরেজিটা পড়িয়ে দিয়ো না। ওর খুব উপকার হয় তাহলে।

আমি প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বললাম, দেখি। ওর মাথা তত খুব ভালো, চট করে বুঝে যায়। তবে... তবে... আমি তো সামনের বছর থেকে বোর্ডিং-এ পড়ব... তখন...

মাসিমা সামলে দিলেন, সে ঠিক আছে। তোমার মতো কারও গাইডেন্স পেলে ও এই ক মাসেও অনেক ধরে নিতে পারবে। আজকাল টিউটরদের কথা জানই তো। পড়ানোর নামে ইয়ার্কি ফাজলামি। টাকার শ্রাদ্ধ।

আমি এতক্ষণে একটু সামলে নিয়েছি। বললাম, তবে মাসিমা ওকে এখানে এসেই পড়তে হবে। আমি তো কোথাও যাই না।

মাসিমা বললেন, বেশ তো, এ তো বেশ ভালোই ঘর পড়ার পক্ষে। কোনো অসুবিধে নেই। বলে ঘরটার ভেতরে একটা পাক দিলেন মাসিমা। তারপর হঠাৎ জানলার পাশে এসে থমকে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো ওঁর একটু একটু করে বড়ো হতে লাগল। বিকিনি পরে উদ্দামভাবে নেচে চলেছে লোরেন। গ্রামে গান বাজছে টোনি ব্রেন্ট-এর 'সামওয়ান এলস ইজ ইন ইয়োর আর্মস টুনাইট।

মাসিমা জানালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর মেয়েকে বললেন, এসো টুম্পা। তারপর হাত ধরে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। বুড়িমা সব দেখে বলল, বউটা রেগে গেল মনে হচ্ছে। কী হল আবার?

আমি বিরক্তির সঙ্গে বললাম জানি না। কে বলেছিল আসতে।

৩.

সময় কী করে কেটে যায় ভগবান ছাড়া কে আর জানতে পারে। সেই যে মাসিমা টুম্পার হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন আমার পড়ার ঘর থেকে ঠিক

তখনই মনে হয় আমার ওই নিজস্ব সিনেমা হলের সব আলো জ্বলে উঠল। খেল খতম।

টুম্পা আর পড়তে আসেনি তারপর। শুধু শুনেছি এর-ওর মুখে ও বলেছে আমি নাকি খুব ভালো পড়াতে পারি। তাহলে আর পড়তে এল না কেন কোনোদিন? এর কোনো উত্তর পাইনি। লজ্জার মাথা খেয়ে কখনো জিজ্ঞেস করতেও যাইনি। কেবল যেদিন বোর্ডিং-এ থাকতে যাব সেদিন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলাম। ওদের জানালার দিকে। দেখা গেলে হাত নাড়ব বলে। সারাদিনে একটিবারের জন্যও জানালাটাও খুলল না কেউ।

মাসিমার সেই হেঁটে যাওয়ার পর থেকে নানা জানালায়, নানা বারান্দায় কে কখন দেখা দিচ্ছে তার হদিশ রাখিনি। আর আজ তিন বছর পর হায়ার সেকেণ্ডারির ফাইনালের পর করব বলে ফের উঠে এসেছি আমার চিলেকোঠায়।

ঠিক আজ উঠিনি, ক-দিন ধরেই উঠেছি। শীতের দুপুরের রোদ কীভাবে আকাশ বেয়ে এধার থেকে ওধার হয় সব খেয়াল করি বই পড়তে পড়তে। বইয়ের পাতার ওপরই কীভাবে একটু একটু করে আলো বদলায় তা আমি ধরতে শিখে গেছি।

টুম্পারা বছর খানেক হল পাড়া ছেড়ে আলিপুরে উঠে গেছে। আর বছর দুই হল নতুন বাড়ি করে আমাদের বাড়ির উলটোদিকে কয়েকটা বাড়ির পর এসে উঠেছেন ডক্টর চন্দ্রকান্ত সেন। দিদি বলছিল, ওর মেয়ে রানি নাকি এই বয়েসেই ফাটাফাটি সুন্দরী। আমি সব শুনে চুপ করে থেকেছি। স্কুল ছাড়ার পরীক্ষার তিনমাস আগে মেয়েদের সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। মনে মনে বলেছি, এক সুন্দরীর পাল্লায় পড়ে ঢের শিক্ষা হয়েছে আমার।

আর আজ সেই রানির এক চিঠি হাতে করে নিয়ে এসেছে বুড়িমা। বলেছে, ওই সেন ডাক্তারের মেয়ে রানি লিকেচে গো। তুমি উত্তর দিলে আমি পৌঁছে দেব। চিঠিটা হাতে করে নিয়ে ছাদের ঘরে এসে পড়তে গিয়ে আমার দম আটকে যাওয়ার শামিল। সে লিখছে :

কী বলে সম্বোধন করব জানি না। ক-দিন হল তোমাদের ছাদে তোমাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখি। কিন্তু তোমার কথা শুনে আসছি অনেক দিন ধরে এ পাড়ায় যে আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড ছিল সেই টুম্পার কাছে। ও চলে যেতে তাই বড়ো একলা লাগে। ওরও লাগত, তুমি বোর্ডিঙে চলে যেতে। বলেছিল তুমি কী সুন্দর পড়িয়েছিলে দুটো ইংরেজি কবিতা।

টুম্পার কথায় বুঝতে পারতাম ও তোমায় ভালোবাসত। ও বলত তোমার প্রিয় গান মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি। ঠিক বললাম তো? এই গানটা আমারও খুব প্রিয়। তুমি যদি একদিন ওয়েন আর ওয়ালটার ডি লা মেয়ারের কবিতা দুটো আমায় পড়ে শোনাও তাহলে ওই গান আমি তোমায় গেয়ে শোনাব। তবে তোমার ওই চিলেকোঠায় নয়, আমাদের এই বসার ঘরে। আমার অন্ধকার আর ভূতে বড়ো ভয়।

যদি আসো তাহলে বুড়িমার হাতে একটা চিঠি দিয়ো।

রানি

জানি না, কী উত্তর লিখব এর! এর উত্তর দেওয়া তো প্রেমে পড়ে যাওয়ার শামিল। পরীক্ষার মুখে কি আমি এই করব!

চিঠিটা একটা পুরোনো ব্যথা আর একটা নতুন রাগও খুঁচিয়ে তুলেছে। পুরোনো ব্যথা হল টুম্পার স্মৃতি আর নতুন রাগ হল আমার চিলেকোঠার প্রতি

রানির খোঁচা। কেন, কী দোষ করেছে আমার চিলেকোঠা? এখান থেকে লোরেনের নাচ দেখতে পাওয়া যায়, এই তো? নিশ্চয়ই টুম্পার কাছে শোনা কথা এসব। তাতে বয়ে গেল আমায়। আমি অভিমানের বশে চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে বাইরে ফেলে জানালা খুলে লোরেনের নাচের অপেক্ষায় রইলাম।

কতক্ষণ বসেছিলাম এভাবে খেয়াল নেই, শেষে লোরেনের নাচ শুরু হল ক্লিফ রিচার্ডের গানের সঙ্গে। আমি মেয়েটিকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কী অপরূপ সুন্দরী আর লাস্যময়ী হয়ে উঠেছে মেয়েটি এই তিন বছরে। দিদি বলছিল ও পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ফুলটাইম ক্যাবারে ডান্সার হয়েছে। নাম নিয়েছে লাশিয়াস লোলা। কলকাতা তো বটেই, সারাভারতেই নাকি ওর জুড়ি নেই। আর কিছুদিন পরই ও দিল্লির ইন্টারকন্টিনেন্টালে পাড়ি দেবে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে লোরেনকে দেখছি। ওর নাচের সঙ্গে একের পর এক বেজে যাচ্ছে প্যাট বুন, ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা, জিম রিভস, কিন্তু আমার মগজে ক্রমাগত বেজেই চলেছে ওই একটাই গান—'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি।' বুঝতে পারছি না সাহেবদের ওই গানে না লোরেনের সৌন্দর্যে না মানবেন্দ্রর গানে মনটা ভিজে জল হয়ে যাচ্ছে। জল আসছে চোখেও, যেন প্রেমে পড়ছি।

শেষে দড়াম করে জানলা বন্ধ করে লজিকের বই খুলে বসলাম। এভাবে চলতে থাকলে আমার পরীক্ষা ডকে উঠবে। নিকুচি করেছে ওই রানির। আমি ওকে চিনি না, আর চিনে কাজও নেই। সেই তো টুম্পার মতো এক ঝড় বইয়ে মিলিয়ে যাবে মহাকালে। তার চেয়ে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

আমি লজিকের সিলোজিসমে ডুব দিলাম। কিন্তু চোখের পাশটা সমানে খচ খচ করে যাচ্ছে। রানি কি খুব কষ্ট পাবে?

হাত নিশপিশ করছে কলম তুলে একটা চিঠি লেখার জন্য। কিন্তু মনের কোণে সারাক্ষণ ভয়। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছি, নীতু, তুমি কি প্রেম করার জন্যই অ্যাদ্দিন পর নিজের ডেরায় ফিরে এলে?

হাত আর মন একই সঙ্গে পাথর হয়ে গেল।

৪.

আমার হাতে ল্যাম্ব রোস্টের প্লেট ধরা, ডান হাতে ফর্কটা দিয়ে একটু ছিড়ছি আর খাচ্ছি। ঘর। ভরতি সাহেব-মেম, দু-তিনটে লণ্ডন প্রবাসী বাঙালি দম্পতি। যাঁর বাড়িতে এসে উঠেছি লণ্ডনে সেই নির্মলদা আর ওর চোদ্দো বছরের মেয়ে সোনালি একে একে সবার সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। মাইনে যেমন তেমনই হোক লণ্ডনে দেখি অধ্যাপকদের সম্মান এখনও আছে। নইলে ইংরেজির তরুণ অধ্যাপক বলে যেই সাহেব মেমদের সামনে আমাকে দাঁড় করাচ্ছেন নির্মলদা অমনি একটা সমীহ ফুটে উঠছে সবার চোখে মুখে, ওহ, রিয়েলি। দ্যাটস গ্রেট। তারপরই লাগোয়া প্রশ্ন, হোয়াট ডু ইউ টিচ? তখন যেই বলছি, ইংলিশ লিটারেচার তখন আর এক-প্রস্থ পুলকিত সমাদর, ওঃ, দ্যাটস মার্ভেলাস! আর এতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাচ্ছে সোনালি। যার চোদ্দোতম জন্মদিন এটা।

যখন আলাপ হচ্ছিল একে একে সবার সঙ্গে তখন হাতে সবার বিয়র কিংবা হুইস্কি ছিল। এখন সবার হাতে সোনালির নিজের হাতে রাঁধা ল্যাম্ব রোস্ট। সে পদের ফরমাশটা কলকাতা থেকে টেলিফোনে ওঁর কাকা আর আমার সহকর্মী রাণার করা। রাণার জোরাজুরিতেই বলা চলে বাউণ্ডস গ্রিনে নির্মলদাদের বাড়িতে এসে উঠেছি। রাণা বলেছিল, যাচ্ছিস তো বাবা ব্রিটিশ কাউন্সিলের কিপটে স্কলারশিপে। টাকাটা বাঁচা, একটু পাবে বসে বিয়র-টিয়র

খা। দু চারটে বই-টই কেন, ক্যাবারে-ফ্যাবারে দ্যাখ। দেখতে দেখতে ছ-সপ্তাহ কেটে যাবে। আর আমার ভাইঝিটি একটি রত্ন। আমি খাইনি। তবে শুনেছি দুর্ধর্ষ ল্যাম্ব রোস্ট রাঁধে। ডোন্ট মিস দ্যাট।

সেই ল্যাম্ব রোস্ট চাখতে চাখতে আমার কেবলই মনে পড়ছে উপস্থিত তরুণ দম্পত্তির ওই আগুনের মতো সুন্দর বউটার মুখ। কেবলই মনে হচ্ছে কোথায় দেখেছি যেন। নিশ্চয়ই কোথাও দেখেছি? কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পারছি না। শেষে হাল ছেড়ে দিতে বসেছি এই স্তোক দিয়ে, আসলে সুন্দরী বলেই এতরকম চিনি চিনি ভাব করছি। এ মুখ এই প্রথমই দেখলাম।

দেখেছি সবারই খাওয়া হয়ে গেছে, সবাই একে একে নিজের নিজের প্লেট নিয়ে কিচেনের সিঙ্কে গিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে। এদেশে কাজের লোকের চল নেই। নিজেরটা নিজে করাই নিয়ম। নেমন্তন্নেও। শেষে আমি উঠলাম প্লেট ধোলাই করতে। বাকিরা সুইট-ডিশ খাওয়া চালু করে দিয়েছে, একজন মহিলা পিয়ানোয় বসে 'কে সেরা সেরা' গানের সুর তুলতে শুরু করেছিল। সিঙ্কের এক ধারে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে আমি প্লেটে পাউডার ঘষছি।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা সুরেলা অথচ অভিমানী মহিলা কন্ঠ ভেসে এল, আমরা চিঠির উত্তর কিন্তু পাইনি।

আমি মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি কিচেনের দরজায় ফ্রেম-আটা মা দুর্গার ছবির মতো দাঁড়িয়ে ওই বউটি, যার পরিচয় নিয়ে এতক্ষণ ভেবে মরছি।

আমি সত্যি সত্যি হকচকিয়ে গেছি। কীসের চিঠি? কার চিঠি? কেন হঠাৎ এই চিঠির কথা উঠছেই বা কেন? ভদ্রমহিলাও আমাকে ঠিক শনাক্ত করেছেন তো?

আমি তোতলাতে তোতলাতে বললাম, আমার কি আপনাকে চিঠি দেওয়ার কথা ছিল?

যুবতী বলল, দেওয়া, না-দেওয়া আপনার মর্জি। কিন্তু আপনি তো চিঠির কথা মনে করতে পারছেন না।

আমি ফের তোতলাচ্ছি, কিন্তু...কিন্তু...

যুবতী বলল, অবশ্য বারো বছর হয়ে গেল তো। ভুলে যাওয়ারই কথা।

আমি ফের অবাক হয়েছি বা-রো ব-ছ-র!

-হ্যাঁ, তা তো হয়েছে। তাতে একটা গান শোনানোর কথা ছিল, ...

ওহ, তাই তো। গানের কথা উঠতেই চিলেকোঠার সন্ধ্যের কথা, বুড়ির বয়ে আনা চিঠির কথা, মানবেন্দ্রর 'আমি এত যে তোমার ভালোবেসেছি'র কথা আর ওই চিঠির প্রেরিকা রানির কথা...বস্তুত স্কুল জীবনের ওই সময়কার সব কথা বন্যার তোড়ের মতো মনে বাঁধ ভেঙে মাথার মধ্যে গোলমাল পাকাতে শুরু করল। আমার হাত-পা দুই-ই অচল হয়ে গেছে, গলা বন্ধ হয়ে আসছে। তার মধ্যেই কোনোমতে উচ্চারণ করলাম, রানি।

রানি হাসল, বাঁকা ছুরির মতো ধার তাতে। আমি, 'আই শুনুন! বলে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ হাত থেকে প্লেটটা ছিটকে মাটিতে পড়ে চৌচির হয়ে

গেল। কী হল! কী হল!' করে ছুটে এল সোনালি। আমি লজ্জায় সিঁটিয়ে গেছি দেখে আমাকে আশ্বস্ত করল, তুমি কিছু ভেবো না কাকু, একটা দুটো ভাঙাভাঙি ইজ গুড ফর দ্য পার্টি। আমি নিরুপায় হয়ে বললাম, তা বলে কি পৃথিবীর সব ভাঙাভাঙির দায়িত্ব আমার! প্লেটের টুকরোগুলো মাটি থেকে কুড়োতে কুড়োতে সোনালি বলল, যারা মানুষের মন ভাঙে তারা সবকিছুই ভাঙতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

হে ভগবান! এই চোদ্দো বছরেই মেয়েটা এতশত জানল আর শিখল কোত্থেকে? সোনালি বিন-এ প্লেটের খন্ডগুলো ফেলছিল, আমি খুব নজর দিয়ে দেখলাম বারো বছর আগের এক কিশোরীর মুখ, যারও তখন বয়স ছিল হয়তো চোদ্দো। যার নাম ছিল রানি। রানি সেন। যে আমায় একটা চিঠি লিখেছিল। যার উত্তর দেওয়া হয়নি আজও। স্বভাবদোষে সেই কিশোরী মুখটিকে ভালো করে মনে গেঁথে রাখতে পারিনি। হয়তো সে সুযোগও পাইনি, কলেজে উঠতেই তো পাড়া ছেড়ে অন্যত্র উঠে গেলাম আমরা। তারপর আর ক-বারই বা ওই পাড়ামুখো হয়েছি আমি!

আমি আস্তে আস্তে সোনালিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের এই রানিদি কি এখনও গান টান করে?

সোনালি অবাক হয়ে গেল যেন গান? জানি না তো উনি গান-টান করেন কি না? জিজ্ঞেস করব?

আমি আর কিছু বললাম না। সোনালি হাত ধুয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, তুমি চলে এসো কাকু। তোমাকে আইসক্রিম সার্ভ করব।

হাতে সুইট ডিশ নিয়ে এবার আমিই জটলার মধ্যে খুঁজে বের করলাম রানিকে। পাশে ওর ডাক্তার বর অমিত। বললাম, তবুও ভালো-যাওয়ার মুখে আপনাদের সঙ্গে আলাপ হল।

অমিত বলল, নির্মলদার কাছে শুনেছি আপনার কথা। এখন আলাপ হয়ে আরও ভালো লাগল। একদিন আসুন না আমাদের ওখানে, আমি আপনাকে পিক করে নেব। চাইলে নিটোল বাঙালি রান্না খাওয়াতে পারি আপনাকে। রানি ইজ আ গুড কুক।

আমি বললাম, রান্না-টান্না ঠিক আছে, তবে আপনার গিন্নি এক আধটা গান শোনালে যাওয়ার টান আরও বাড়ত।

অমিত এবার সত্যিই অবাক হয়ে গেছে—গান? আপনি কী করে জানলেন রানি গান জানে?

বেকায়দায় পড়ে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম কথা ঘোরাবার। আসলে ওকে দেখেই মনে হয় ভালো গান জানেন।

এবার উত্তর করল রানি, জানতাম। সব ভুলে গেছি। গান শোনানোর মতো লোক চাইলেও তো পাওয়া যায় না।

বললাম, কেন, অমিতবাবু?

অমিতই প্রতিবাদ করল, আর বলবেন না মশাই, যা কাজের শিডিউল এখানে। নিজেও এককালে একটু আধটু রবীন্দ্রসঙ্গীত করতাম। সব চুকে বুকে গেছে।

বুকে বল সঞ্চয় করে বললাম, গিন্নিও কি বাংলা রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে?

অমিত বলল, না, না, ওর গলায় বাংলা আধুনিক দারুণ খেলত। লতা, গীতা, সন্ধ্যা, হেমন্ত, শ্যামল, মানবেন্দ্র...

মুখ ফুটে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল, বাঃ অপূর্ব। তারপর একটু থেমে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা, মানবেন্দ্রর 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি' গানটা কি ...

আমার কথার মধ্যেই কীরকম এক সুরেলা অভিমানী কণ্ঠে বলে উঠল রানি, না না, ওই গানটা কখনো তোলা হয়নি নীতিনবাবু।

আমার হাতের আইসক্রিমের প্লেটটা যেন আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বুঝলাম, গলাটাও বসে যাচ্ছে। রানি আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে পার্টির অন্যদের দেখতে শুরু করল। এক আধবার হাতে ঘড়িও দেখল। যেন এক্ষুনি চলে যেতে হবে।

আমি অমিতকে একটু আসছি বলে সরে এসে কিচেনের দরজা দিয়ে পিছনের বাগানে গিয়ে তারার অন্ধকারে দাঁড়ালাম। কৈশোরের ছাদের সেই অন্ধকারগুলো ভিড় করে আসছে। মনের ওপর। ফিকে একটা সুরের ধ্বনি বেরিয়ে আসছে পার্টিরুম থেকে। সেই মহিলা পিয়ানোয় এবার ধরেছেন–'আই কুড হ্যাভ ড্যান্সড অল নাইট, অ্যাণ্ড ইয়েট বেগ ফর মোর'। আর একটু একটু করে আমার মগজে ছড়াচ্ছে একটা বাংলা আধুনিক প্রেমের গান যেটা কিশোরী রানির কণ্ঠে আমার শোনার কথা ছিল, হয়নি।

একটা ক্লাসের পর একটা পিরিয়ড ব্রেক ছিল। আমি বেয়ারা সঞ্জীবকে এক পেয়ালা কফির অর্ডার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম লেকচারার্স

রুমে। সবে দু-তিনটে টান দিয়েছি সুখ করে হঠাৎ পায়ে মৃদু স্পর্শ কীসের। চোখ তুলে দেখি প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াল তিস্তা।

তখনও ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়ায়নি, আমি হাত বাড়াতেই ওর মাথাটা পেয়ে গেলাম। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, থাক, থাক, এখানে আর এত প্রণাম-ট্রণামের কী আছে? তারপর একটু থেমে বললাম তা কী ব্যাপার বল?

বড়ো বুদ্ধিমতী এই মেয়ে, ক্লাসে, এমন সব প্রশ্ন করে সময় সময় তা ওর বি এ সেকেণ্ড ইয়ারের তুলনায় ঢের মেচিওর্ড। ওই প্রশ্নগুলো করা ছাড়া ওর গলায় শব্দ বিশেষ শোনা যায়। ওর চেহারার মতো স্বভাবেও কীরকম একটা স্নিগ্ধ নির্জনতা লুকিয়ে আছে। হয়তো একটা অস্পষ্ট বেদনাও।

স্নিগ্ধ চাপা স্বরে বলল, স্যার, মার খুব ইচ্ছে আপনি শেক্সপিয়রের পেপারটায় আমায় একটু প্রাইভেট টিউশন দিন। অনেক বলেছি মাকে যে আপনি প্রাইভেট করেন না। তবু মা ঠিক বুঝতে চাইছে না।

কথাটা ভুল না। প্রাইভেট টিউশন ব্যাপারটাতেই আমার ঘোর আপত্তি। কলেজে পড়াচ্ছি পড়াচ্ছি। কিন্তু তার বাইরে প্রাইভেট নোট সাপ্লাই করে পয়সা কামানোকে আমি পাটোয়ারি ছাড়া অন্য কিছু ভাবি না। কলেজের বাইরে সব সময়টাই আমার নিজের। বই পড়ব, গান শুনব, চাইলে একটা উপন্যাস লিখব, কিন্তু নোট সাপ্লাই নৈব নৈব চ।

কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই তিস্তা বলল, মা বলছিল মা আপনাকে চেনে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী নাম তোমার মা-র?

কোথায় থাক তোমরা? তিস্তা প্রশ্নের উত্তরের বদলে একটা খাম দিল আমার হাতে। তাতে ছোট্ট একটা চিঠি, আমি পড়তে শুরু করলাম–

প্রিয় নীতুভাই,

আশা করি কুশলে আছ। তোমার পড়ানো আর বিদ্যার সুনাম সব সময়ই শুনতে পাই। তিস্তা তো তোমার পড়ানো নিয়ে কী পাগলামোই না করে। বলে স্যার নিশ্চয় আগের জন্মে অক্সফোর্ডের সাহেব অধ্যাপক ছিলেন। আমি শুনি আর খুব গর্ব হয় আমার। তুমি প্রেসিডেন্সিতে পড়ছ সে খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু সেই কলেজেই তুমি ডাকসাইটে প্রোফেসর হয়েছ শুনে যে কী ভালো লেগেছিল তা বলে বোঝাতে পারব না।

আমার এই একটাই মেয়ে তিস্তা। বই ছাড়া ওর আর কোনো বন্ধু নেই। ক-বছর আগে তোমার জামাইবাবুর একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। একটা দিক পড়ে গেছে বেচারির। আর্লি রিটায়ারমেন্টে আছেন ভদ্রলোক। কাজেই সংসারে অভাব না থাকলেও হাজার দেড় হাজার টাকা দিয়ে মেয়েকে প্রাইভেট টিউশন দেওয়ার সেই সচ্ছলতাই নেই। তিস্তার কিন্তু বড়ো আকাঙ্ক্ষা একটা ফাস্ট ক্লাস পায়। সেজন্যে তোমার কাছে পড়ার বড়ো বাসনা ওর। তাই যদি দিদির মেয়েটাকে স্নেহ করে একটু সময় দাও বড়ো আনন্দ পাই।

তোমার জামাইবাবুর অসুস্থতার পর থেকে উত্তরপাড়ার এই সাহেব বাড়ির উঠোন ছেড়ে কোথাও যাওয়া হয় না আমার। কিন্তু তুমি যদি ভালোবেসে এই দিদিটাকে একদিন দেখতে আসো বড়ো শান্তি পাব। তিস্তাকে যদি একান্ত পড়াতে নাই পার একবারটি অন্তত আমাদের দেখতে এসো। ঈশ্বর তোমার অনেক খ্যাতি, সম্মান আর দীর্ঘজীবন দিন, এই প্রার্থনা করি।

ইতি–

লালিমা

চিঠিটা পড়তে পড়তে বুকের ভেতর একটা অব্যক্ত ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। আমি চিঠিপড়া শেষ করেই তিস্তার মুখের দিকে তাকালাম। তাই তো সেই গমের মতো গায়ের রং। সেই টানাটানা, বড়ো বড়ো চোখ। গালে সেই টোল। সেই লাজুক হাসি। এমনকী চুলের বিনুনি আর শাড়ি পরারও সেই একই টং।

আমি চিঠিটা পাট করে খামে ভরে পকেটে রেখে বললাম, তিস্তা, তুমি সামনের সপ্তাহ থেকে মঙ্গল আর শুক্রবার সন্ধ্যে ছটায় আমার বাড়ি চলে এসো। এই নাও ঠিকানা।

তারপর কী একটা ভেবে ফের বললাম, কিন্তু তিস্তা, সন্ধ্যে আটটা সাড়ে আটটার পর তুমি উত্তরপাড়া ফিরবে কী করে?

বোধহয় এই প্রথম তিস্তা এত জোরের সঙ্গে জবাব দিল, স্যার ও আমি পারব। এত কিছু দূর নয় উত্তরপাড়া। কত বাস। কত ট্রেন। মার একটু চিন্তা হবে ঠিকই কিন্তু মা-ই তো চাইছে।

তিস্তা ফের টেবিলের তলা থেকে আমার পা খুঁজে বার করে প্রণাম করল। আমি বললাম, থাক থাক। তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বললাম, মাকে বলবে কোনোরকম মাইনে দেওয়ার চেষ্টাও যেন না করা হয়। তাহলেই পড়ানো বন্ধ। তিস্তা হাসল, ওর ওই মায়ের মতো লাজুক চোরা হাসি।

কী করে, কী করেই যে সময় কেটে যায়। আজ তিস্তার সেকেণ্ড পার্টের রেজাল্ট বেরিয়েছে। প্রথম পার্টে মাত্র নয় মার্কের জন্য ফার্স্টক্লাস মিস

করেছিল বেচারি। দ্বিতীয় পার্টে সব মেক আপ করে সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট নিয়ে ওভারল শুধু দীপ্তিময় বসু।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই শুনি বৃন্দা বলল, তিস্তা ফোন করেছিল। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে। একটু পরেই দেখা করতে আসছে। তুমি বেরিয়ে যেয়ো না কিন্তু।

আমি গা ধুয়ে পাজামা-পাঞ্জাবি চাপিয়ে সবে এসে বসার ঘরে বসেছি তিস্তা ঢুকল বিরাট মালপত্তর নিয়ে। আমি অবাক হয়ে বললাম। এসব কী রে তিস্তা? তিস্তা ওর বস্তা-টস্তা আমার পায়ের কাছে রেখে, প্রণাম সেরে বলল, কিছু না।

বললাম, কিছু না তো এসব বগলে করে আনলি কেন? তিস্তাকে এখন তুই' করেই বলি, ও-ও স্যার-টার ঝেড়ে ফেলে ডাকে মামু। ও বলল

মামু, এসব মা-র কীর্তি, আমি কি জানি না।

দেখতে দেখতে ঝোলা থেকে বেরুল আমার ধুতি, পাঞ্জাবি, সুট লেংথ। বৃন্দার জন্য শাড়ি, এইচ এমটি ঘড়ি আর আমাদের কন্যা নন্দিনীর জন্য এক গুচ্ছের খেলনা। সেইসঙ্গে ভীমনাগের সন্দেশ।

বৃন্দাও ঘরে ঢুকে এতসব দেখে হতবাক। আমি বললাম, তিস্তা তোকে পড়ানোর জন্য তো কোনো টাকার কথা হয়নি। তাহলে এসব করতে গেল কেন তোর মা?

তিস্তা বলল, মামু আপনাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই ঠিকই। কিন্তু মা-রও তো কিছু দিতে ইচ্ছে করে।

আমি চুপ করে গেলাম। বৃন্দা বলল, দাঁড়াও তোমাদের কফিটা করে আনি।

ও চলে যেতে তিস্তাকে বললাম, হ্যাঁরে, বাবা কেমন আছেন?

ও বলল, বাবা ঠিকই আছে। মা ভালো নেই।

তিস্তা বলল, আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা।

-তোকে নিয়ে দুশ্চিন্তা! কেন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস বলে?

–না, সৌম্যকে বিয়ে করতে চাই বলে।

—সৌম্য কে?

—ফিলজফির সৌম্য। গতবারে এম এ পাস করেছে।

—তাতে কী হল?

—ছেলেটার চালচুলো নেই। মার ভীষণ আপত্তি।

জিজ্ঞেস করলাম, চাকরি করে?

তিস্তা মাথা নীচু রেখেই বলল, কলেজ টিচার্স প্যানেলে নাম উঠেছে, এখনও পোস্ট পায়নি।

—তা হলে?

–আপনাকেই বোঝাতে হবে মাকে।

–মা কী বলে?

-বলে, তোর জন্য অনেক কষ্ট করেছি জীবনে। ছোটো থেকেই কষ্ট করছি। তোরও কষ্ট দেখলে মরে যাব।

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল আমার। লালিমার কষ্ট তো আমি নিজেও দেখেছি। হে ভগবান, ওই কষ্ট যেন তিস্তার ওপর না গড়ায়।

বললাম, সৌম্য, ছেলে কেমন?

তিস্তা বলল, অপূর্ব! তবে প্র্যাক্টিক্যাল সেন্স কম। না হলে উচ্চমাধ্যমিকের স্ট্যাণ্ড করা ছেলে ফিলোজফি পড়তে যায়? এদেশে এই সাবজেক্ট নিয়ে অধ্যাপনা ছাড়া কিছু জোটে?

-কেন অধ্যাপনা খারাপ পেশা? আমি করি না?

–ও-ও আপনার মতোই বলে, জীবনে টিউশনি করব না, নোট বেচব না।

—তাহলে শুধুই পড়াবে?

—আর বলে শংকরাচার্য নিয়ে গবেষণা করবে।

আমার বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল ব্যথায়। জীবনে কত বাসনা ছিল কান্ট-এর দর্শন নিয়ে গবেষণা করব। পড়াতে পড়াতে কীভাবে সময় চলে গেল। ইংরেজির লোক হয়েও দর্শনের ওপর এই মোহ আমার কাটল না অ্যাদ্দিনে। টিউশনি যে করি না তার একটা কারণও দর্শন পড়ার জন্য সময় বাঁচানো।

আবার আনন্দও হল সৌম্যর কথা ভেবে। আজকের এই র‍্যাট রেসের দিনেও একটা ছেলে শংকরাচার্য নিয়ে পড়তে চাইছে। আমার চটকা ভাঙল তিস্তার কথায়। মামু, আপনি মাকে বোঝাবেন।

বললাম, বোঝাতে পারব কি না জানি না। তবে চেষ্টা করব।

কফি আর খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে বৃন্দা বলল, তোমরা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ডেও মন ভরছে না?

আমি কফির পেয়ালা হাতে নিতে নিতে পরিবেশ হালকা করার জন্য হিন্দি সিনেমার চালে বললাম, সমস্যা গম্ভীর হ্যায়।

রাতে শুয়ে আছি, চোখে ঘুম নেই। একটু আগে বেডল্যাম্প জ্বেলে নীরস বই পড়েও ঘুম আনানোর চেষ্টা করেছি, কাজ হয়নি।

পাশ ফেরার বহর দেখে মনে হচ্ছে বৃন্দার চোখেও ঘুম নেই। বোধহয় তিস্তার সমস্যা এখন আমাদের দুজনের ওপরই ভর করেছে। হঠাৎ শুনি অন্ধকারে বৃন্দার গলা, সব শুনলে ওর সমস্যা?

বললাম, শুনলাম তো। দেখি ওর মার সঙ্গে কথা কয়ে।

বৃন্দা বলল, লাভ নেই।

-কেন?

—সমস্যা যে মেটার নয়।

—কেন, ছেলে কি খারাপ?

—চমৎকার ছেলে। ফুসফুসটা খারাপ। লিমাদির আসল আপত্তি ওইখানে, তিস্তা চেপে গেছে।

-ফুসফুঁসের কী হল আবার?

—সাসপেক্টেড প্লুরিসি। কিছুদিন হল ধরা পড়েছে।

—এই বয়সে যক্ষ্মা?

—ছেলেটা যে বাল্যকাল থেকে অপুষ্টিতে ভুগছে। বাব নকশাল, মা নকশাল। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থেকে থেকেই তো সংসার করেছে। ভালো চাকরি খুইয়েছে। ছেলেটার বোধহয় ভালো করে দুধও জোটেনি কোনোদিন। পিসিমার কাছে বড়ো হয়েছে।

–তা তুমি এতসব জানলে কোত্থেকে?

—তিস্তার কাছেই শুনেছি। যাকগে তুমি এখন ঘুমোও। কাল দশটায় ক্লাস আছে। মনে আছে?

আমি অন্ধকার ঘরের মধ্যে আরও গভীর এক অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল চা নিয়ে বৃন্দার ডাকে, ওঠো সাড়ে ছটা বেজে গেছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কী ভাবছিলাম জানি না, বৃন্দা স্টেটসম্যানটা নিয়ে এসে আমার সামনে রাখল। কাগজটা উলটেপালটে দেখবারও উৎসাহ পাচ্ছি না। শুনি, বৃন্দা বলছে। আচ্ছা প্লুরিসি সারে না? আমি হেসে ফেললাম, কী যা-তা বলছ? চিকিৎসা হলেই সারবে। কথা হচ্ছে, সেজন্য পয়সা লাগবে।

বৃন্দা বলল, সেটাই তো কথা। বেকার ছেলে কোথায় পাবে? বললাম, আর শুধু তো চিকিৎসা নয়, ভালো পথ্যও চাই।

হঠাৎ বৃন্দা বলল, আচ্ছা তুমি পার না ওকে এই সাহায্যটা করতে?

আমি হাসলাম। টাকা তো সব তোমার কাছেই থাকে। তুমিই তো ভালো জান আমার কতটুকু কী সম্বল। মাস গেলে আরও দু-আড়াই হাজার টাকার কমিটমেন্ট তো ইয়ার্কি নয়।

তা ঠিক। বলে আরেক কাপ চা আনতে উঠে গেল বৃন্দা। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার শরীরে হঠাৎ এক অদ্ভুত উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। তিস্তার সমস্যার সমাধানের একটা আশা যেন দেখতে পাচ্ছি সহসা। বলতে গেলে তিস্তাই হদিশটা দিয়ে গেল নিজের অজান্তে।

ও চা নিয়ে ফিরতেই আমি সমাধান বাতলে দিলাম, বৃন্দা বাড়তি দু-তিন হাজার কিন্তু সমস্যা হওয়ার কথা নয় আমার কাছে। কথার মাথামুন্ডু ধরতে না পেরেও ও বলল, কীরকম?

-কেন প্রাইভেট টিউশনি?

—টিউশনি! তুমি টিউশনি করবে, যাতে তোমার এত ঘেন্না, আমার স্কুলের টিউশনিও ছাড়িয়ে দিলে যে কারণে।

বললাম, প্রয়োজন। প্রয়োজনে মানুষ সব করে। কথায় আছে না? অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যাণ্ড ওয়ার। প্রেম ও যুদ্ধে সবই বলিদান দেওয়া চলে। আমি না হয় ছ-আট মাস কি এক বছরের জন্য আমার নীতিকেই উৎসর্গ করলাম।

বৃন্দা বলল, তো এই নীতি বর্জন যুদ্ধ না প্রেমের জন্য?

বললাম, প্রেম। তিস্তার প্রেম।

মনের ভিতর খেলে গেল দূর অতীতের দুই বন্ধুর দিদির জন্য ক্ষণকালের এক প্রেমের স্মৃতিও। লালিমার খোলা বুকে শিশুর মতো হাত ছুইয়ে বসে এক স্বর্গের স্বাদ। ঠিক সময় জানালা দিয়ে দিনের প্রথম রোদ্দুর এসে বৃন্দার মুখে পড়ে ওকে উদ্ভাসিত করে তুলল।